

‘নামিদামি কলেজে গিয়ে’ হারিয়ে যাচ্ছে জিপিএ ৫

শরীফুল আলম সুমন >

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পছন্দ রাজধানীর নামিদামি কলেজ। ওই সব কলেজে ভর্তি হতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায় শিক্ষার্থীরা। এসএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি সীমাবদ্ধ থাকে কয়েকটি কলেজ ঘিরেই। কিন্তু দেখা যায়, নামিদামি কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পাচ্ছে না অনেক শিক্ষার্থী। আবার নামডাক খুব একটা নেই এসব কলেজে ভর্তি হয়ে এসএসসিতে জিপিএ ৫ না পাওয়া অনেকে এইচএসসিতে ঠিকই জিপিএ ৫ পেয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষায় ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রেও আধিক্য থাকে অপেক্ষাকৃত ছোট কলেজ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদেরই।

সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিভাগের করা এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে আসে। গবেষণায় ২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়ে ভর্তি হওয়া নামিদামি ১০ কলেজের ২০১৫ সালের এইচএসসির ফলের সঙ্গে ওই বছর এইচএসসিতে বেশি জিপিএ ৫ পাওয়া ১০ কলেজের ফলের তুলনা করা হয়। এতে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত ছোট কলেজে ভর্তির সময়ে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর তুলনায় এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। আর এসএসসিতে জিপিএ ৫ নিয়ে নামিদামি কলেজে ভর্তি হলেও এইচএসসিতে তাদের অনেকেই জিপিএ ৫ হারিয়ে ফেলেছে।

মাউশি অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিভাগের উপপরিচালক কামাল উদ্দিন হায়দার কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘কোনো কলেজের পড়ালেখার মান কেমন তা বোঝার জন্যই এই গবেষণা করা হয়েছে। এসএসসিতে জিপিএ ৫ না পেয়েও এইচএসসিতে যে জিপিএ ৫ পাওয়া যায় তা অনেক কলেজই প্রমাণ করেছে। আবার নামিদামি কলেজে ভর্তি হলেই যে জিপিএ ৫ পাওয়া যাবে তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আসলে কোন কলেজ কিভাবে পড়ালেখা করাচ্ছে তার ওপরই ভালো ফল নির্ভর করে।’

গবেষণা থেকে জানা যায়, ২০১৩ সালে সরকারি বিজ্ঞান কলেজে এক হাজার ২০০ আসনের সব কটিতেই জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। আর ২০১৫ সালের এইচএসসিতে এই শিক্ষার্থীদের

মধ্যে থেকেই জিপিএ ৫ পায় মাত্র ২৭৩ জন। অর্থাৎ এই কলেজে পড়ে জিপিএ ৫ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে ৯২৭ জন। নটর ডেম কলেজে দুই হাজার ৬০১ আসনের মধ্যে দুই হাজার ১৩৫ জন জিপিএ ৫ নিয়ে ভর্তি হয়। অর্থাৎ এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পায় এক হাজার ৬৩৭ জন, জিপিএ ৫ হারায় ৮৬৪ জন। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে এক হাজার ২৪৯ আসনের মধ্যে এক হাজার ১১৯ জন জিপিএ ৫ নিয়ে ভর্তি হয়। অর্থাৎ এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পায় ৭২২ জন। শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে এক হাজার ১১০ আসনের মধ্যে ৬৬৫ জন জিপিএ ৫ নিয়ে ভর্তি হয় কিন্তু এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পায় মাত্র ২৬৮ জন। বিসিআইসি কলেজে এক হাজার ৩১০ আসনের মধ্যে জিপিএ ৫ নিয়ে ভর্তি হয় ৫০৬ জন। কিন্তু এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পায় মাত্র ২২৪

অপেক্ষাকৃত ছোট কলেজ ভালো ফল করছে

জন। সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০১৫ সালের এইচএসসিতে জিপিএ ৫ হারায় ২৭৯ জন, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে ২৪৭ জন, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজে ২২৩ জন, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিলে ২০৭ জন এবং রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে জিপিএ ৫ হারায় ১৯৭ জন।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিলের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘এসএসসির বেশির ভাগ বিষয়ে একটি পত্র। ফলে তিন বিষয়ে জিপিএ ৫ না পেয়েও দেখা যায় অন্যগুলো মিলে সে জিপিএ ৫ পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এইচএসসিতে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই দুই পত্র করে। ফলে এক বিষয়ে না পেলে তার কভার করার সম্ভাবনা কম। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসে তারা ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট করতে পারে না। অনেকেই প্রথমদিকে উদাসীন থাকে। ফলে যে নিজ থেকে সচেতন না হয় সে শেষ পর্যন্ত আর পেরে উঠে না। আবার যারা জিপিএ ৫ পেয়ে বিজ্ঞান থেকে কমার্স বা

মানবিক যায় তাদের অনেকেই জিপিএ ৫ পায় না।’ অপরদিকে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ২০১৩ সালে এক হাজার ৩৮৭ আসনের মধ্যে জিপিএ ৫ নিয়ে ভর্তি হয় ৫৭৩ জন। ২০১৫ সালের এইচএসসির ফলে ওই শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকেই জিপিএ ৫ পায় এক হাজার ৫৭ জন। অর্থাৎ জিপিএ ৫ বাড়ে ৮৮৪ জনের। ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে ৭৮৮ আসনের মধ্যে জিপিএ ৫ নিয়ে ভর্তি হয় ২১৫ জন। অর্থাৎ এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পায় ৬৮৫ জন। ক্যামব্রিয়ান কলেজে এক হাজার ৪১ আসনের মধ্যে জিপিএ ৫ নিয়ে ভর্তি হয় ২৯৭ জন। এদের মধ্যে এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পায় ৬৮৯ জন। একইভাবে সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০১৫ সালের এইচএসসিতে জিপিএ ৫ বাড়ে ১৯১ জনের, বিএন কলেজ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ৭৮ জন, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩৫ জন, আমিরজান কলেজে ২৯ জন, বিএএফ শাহীন কলেজে ২৪ জন, বনফুল আদিবাসী গ্রীন হার্ট কলেজে ১১ জন ও কলেজ অফ ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভে জিপিএ ৫ বৃদ্ধি পায় ১০ জনের।

ক্যামব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশার কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের গ্রন্থ বোঝাটাই সবচেয়ে কঠিন। এমনকি অনেক শিক্ষকও এই বিষয়টি বোঝেন না। আমরা মাস্টার ট্রেনিং দিয়ে শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও প্রশিক্ষণ দেই। এ ছাড়া বেশির ভাগ কলেজের শিক্ষার্থীরাই প্রাইভেটের ওপর নির্ভরশীল। এতে তারা বইয়ের খুঁটিনাটি পড়ে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীদের পুরো বই পড়তে হয়। এতে রচনামূলক ও এমসিকিউ সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান লাভ করে শিক্ষার্থীরা। ফলও ভালো হয়।’

সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, ‘বছরের শুরু থেকে আমাদের একটা প্রাণান্তকর চেষ্টা থাকে। সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মডেল টেস্ট নিয়ে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তোলা হয়। এক দিন কোনো শিক্ষার্থী না এলে তার বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হয়। এ ছাড়া ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষককে কাউন্সেলিংয়ের জন্য রাখা হয়েছে। এই ২০ জনের কেউ খারাপ করলে এর দায়িত্ব ওই শিক্ষকের। এমনকি শিক্ষকরা তাঁর গ্রুপের প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়েও খোঁজখবর নেন।’